সবুজের ইস্তাহার

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

সবুজের অভিযান

বর্ষ : ২ সংখ্যা ৫ ডিসেম্বর, ২০০৯ দাম ২ টাকা

আঁধারে আত্মহনন

বিশ্বজিত মুখোপাধ্যায়

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে একগুচ্ছ দেশ পৃথিবী জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় আলোচনা করেছেন। অতীতে এই ধরনের আলোচনা যে হয়নি এ ভাবার কোন কারণ নেই। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্যানেলের প্রতিবেদনগুলিতে প্রতিফলিত বৈজ্ঞানিক ঐক্যমত যে বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জীভূত গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ অতি দ্রুত বিপদসীমা অতিক্রম করতে চলেছে, যার ফলে অপরিবর্তনীয় এবং প্রলয়ংকর বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন ঘটবে। এই পরিবর্তনগুলি যেমন সমগ্র মানবজাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তেমন এই বিষয়টি সুস্পষ্ট যে দরিদ্র মানুষ বিশেষত উন্নয়নশীল দুনিয়ার মানুষরাই সর্বাপেক্ষা বেশি কুফল ভোগ করবে। ভারতের সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকায় সম্ভাবনা রয়েছে হিমালয়স্থিত অঞ্চল ও সমুদ্র উপকূল এলাকা।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ুর পরিবর্তন যে অশনি সংকেত ভারতবর্ষের বুকে বয়ে নিয়ে আসছে তার সম্ভবত অন্যতম প্রমাণ আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবন ও উড়িষ্যার উপকূল এলাকার মানুষের দুর্দশা। সুন্দরবনে আয়লা আক্রান্ত মানুষ কিয়োটো প্রটোকল বা কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে চিন্তিত নয় কারণ ওখানে যে সমস্ত আলোচনা হবে তাতে ওরা ব্রাত্য। ভারতবর্ষের বেশ কিছু প্রাজ্ঞ মানুষ তথা রাজনীতিবিদরা প্রচার চালান যে ভারতবর্ষের মানুষরা উন্নত দেশের থেকে অনেক কম সম্পদ ব্যবহার করে। ফলত উন্নত দেশগুলি কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করবেন এবং এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণের হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে বেশ বিপ্লবী কথা মনে হতে পারে, মনে হতে পারে উন্নত দেশগুলি সম্পর্কে ভারতের এই মত বেশ গ্রহণযোগ্য। ভারতবর্ষের শিল্পপতিরা ও খুব বেশি হলে ভারতের দশ ভাগ মানুষ মূল ব্যবহৃত জাতীয় সম্পদের ৮০ ভাগ ব্যবহার করেন যার অর্থ দাঁড়ায় ভারতবর্ষের মাটি থেকে যে পরিমাণ কার্বন প্রকৃতিতে মিশে যায় তার জন্য মূলত দায়ী অল্প সংখ্যক মানুষ। শিল্পপতিরা মহা আনন্দে পুরাতন প্রযুক্তি দিয়ে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থা চালিয়ে যাচ্ছেন, আশেপাশে মানুষের বুকে কালো ধোঁয়া ঢুকিয়ে অর্থবান হচ্ছেন, শ্রমিকরা পেটের দায়ে কালো ধোঁয়ার মধ্যেই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। শিল্পপতিদের সম্ভবত অতিরিক্ত মুনাফা করার মূলমন্ত্র শ্রমিকদের প্রাপ্য না দেওয়া এবং পরিবেশগত কোনরকম ব্যবস্থা না নেওয়া। স্পঞ্জ আয়রন থেকে জুটমিল, খাদান থেকে ইটভাটা সর্বত্রই হাজার হাজার নিরন্ন শ্রমিক, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করে এক নিদারুণ ক্লান্তিময় জীবনযাপন করে এবং সর্বশেষে এক চরম অবহেলিত মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষারত হয়ে যায়। শিল্পপতিরা বা তাদের অতিপরিচিত প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদরা আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলনে যোগ দেবেন আর বিপ্লবী ভাষায় বলবেন ভারতবর্ষের মানুষ অত্যন্ত গরিব ও উন্নত দেশের থেকে কম প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, সুতরাং ভারতবর্ষের উপর কার্বন নিঃসরণের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। অথচ নিজের দেশেই শিল্পপতিদের অমানবিক ও পরিবেশ প্রতিকূল ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। ভূপাল থেকে নিয়ে ভারতবর্ষের বিস্তৃত খাদান অঞ্চলে বা অন্যান্য বিভিন্ন কারখানাতে পরিবেশ দূষণে বা পরিবেশ দুর্ঘটনায় কত মানুষ কতভাবে মারা গেছে, সে ব্যাপারে প্রায় কোন তথ্যই নেই, কারণ ভারতবর্ষে অনাহারে, অনাদরে শ্রমিকের মৃত্যু আজও আমাদের সমাজ জীবনে প্রভাব ফেলে না।

ভূপালের ঘটনায় কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু আমাদের সম্বিত ফেরাতে পারেনি। ক্রমাগত মৃত্যুর মিছিল, সেই মিছিল মাড়িয়েই পৃথিবীর একশো জন অন্যতম ধনী ব্যক্তির মধ্যে ভারতবর্ষের শিল্পপতিরা ঢুকে পড়েন। অর্থনীতিবিদরা সার্বিক ভারতের গড় উৎপাদন নিয়ে গর্ব অনুভব করেন। কিন্তু যখনই কার্বন নিঃসরণের বিষয়টি আসে, তখনই ভারতের না খেতে পাওয়া গরিব মানুষগুলির মুখ তুলে ধরে পৃথিবীকে বোঝাতে আরম্ভ করেন তাদের কোন দায় বা দায়িত্ব নেই।

অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় গৃহস্থালিতে, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে, বেশির ভাগ দরিদ্র মানুষের আধুনিক শক্তি ব্যবহারের সুযোগ নেই। ভারতে শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসাম্য ভারতীয় জনগণের বৃহদাংশের অপ্রতুল উন্নয়নের একটি বড় কারণ। সরকারের নীতিসমূহ, বিশেষত যে সরকার আম-আদমির জন্য কাজ করার দাবি করে, সমাজের এই অংশের জন্য নির্দিষ্টভাবে আরও শক্তি সরবরাহ করতে পুনর্বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন এবং দারিদ্র দূরীকরণের সমস্ত উদ্যোগের ক্ষেত্রে একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসাবে সূত্রায়িত হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে নিঃসরণ অবধারিত ভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং অবশ্যই সমাজের সচ্ছল অংশ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসমূহের সঙ্গে যুক্ত শক্তি সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে এই বৃদ্ধির

এর পর দুইয়ের পাতায়

একের পাতার পর

ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ভারতের কর্পোরেট সেক্টরকেও এমন একটা পন্থা অনুসরণ করতে হবে যাতে পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। পরিবেশ-অনুকূল ও সামাজিক সাম্য-নির্ভর উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ভারতবর্ষের শিল্পপতিরা যে অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় কার্বন নিক্ষেপ করে তা নিয়ন্ত্রিত হলে দেশেরই সম্পদ রক্ষিত হয়। অপ্রয়োজনে ও কেবল অর্থের দম্ভে অনেকগুলি ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার ভারতবর্ষের তথাকথিত উচ্চবিত্ত মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। ভারতবর্ষে অর্থ থাকলে যত খুশি গাড়ি কেনা যায়, বিদ্যুৎ অপচয় করা যায়, যত খুশি জল ব্যবহার করা যায় ও নষ্ট করা যায়। এমনকী অপরাধ করলেও কোনও সাজা হয় না। এই সব কিছু করে আবার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে অনর্গল পরিবেশ নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া যেতে পারে। এমনকী নিরন্ন মানুষের ছবি দেখিয়ে প্রয়োজনবোধে দেশে বিদেশে কিছু অর্থ উপার্জন হতে পারে। কিন্তু এর শেষ কোথায়। শেষের পরে কিন্তু বিত্তবান মানুষেরও পালিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

গরিব মানুষের দোহাই দিয়ে সম্পদের অপচয় অদূরদর্শিতারই নামান্তর। সুন্দরবনের মানুষের দুর্দশা আজও হয় তো সুখী মানুষকে স্পর্শ করে না কিন্তু নিষ্কৃতি নেই; বিশ্ববিজ্ঞানীর দল বলছেন এই শতাব্দীর শেষ ভাগের মধ্যে কলকাতা হারিয়ে যেতে পারে জলের তলায়, ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী অনেক ভূখণ্ডই হয়ত আগামী দিনে সমুদ্রের অভ্যন্তরে অতীতের ইতিহাস খোঁজার দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে যাবে।

সুফলা বাংলায় জল সংরক্ষণ

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ আমাদের। খাল-বিল-নদী-নালাতে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলা তো জলসম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাহলে এখানে জল সংরক্ষণ করতে হবে কেন? প্রথমেই এই প্রশ্নটিই মনে আসে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা দরকার সাহিত্যে দুর্ভিক্ষা সুজলা বলা হলেও বাংলার সর্বত্র যে জলের প্রাচুর্য রয়েছে তা কিন্তু নয়। আমাদের বাংলাতেই রয়েছে পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার মত জেলা যেখানে জলাভাব এক বড় সমস্যা। জল থাকলেও রয়েছে জল ব্যবহারের সমস্যা। আমাদের জল ব্যবহারের একটা বড় অংশ হল মাটির তলার জলের ব্যবহার। মাটির তলার এই জল তৈরি হতে বহু বছর সময় লাগে অথচ যখন নলকূপ বসিয়ে তা কৃষিজমিতে সেচের প্রয়োজনে বা পানীয় জলের প্রয়োজনে তোলা হয় তখন এই জল তৈরির দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কথা ভাবা হয় না। অগভীর নলকূপ বসিয়ে এই ভাবে জল তুলে নেওয়ার আর একটা কুফল বাংলার ১৯টি জেলার মধ্যে ৯টি জেলাই আর্সেনিক কবলিত। বাংলার সর্বাপেক্ষা আর্সেনিক পীড়িত জেলাগুলি হল মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। আর্সেনিকের পাশাপাশি রয়েছে জলে ফ্লোরাইড, রোগজীবাণু, কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের সমস্যা। কাজেই সুপেয় জলের অভাব বাংলায় যথেষ্ট রয়েছে। আর সেজন্যই দরকার জল সংরক্ষণ।

জল সংরক্ষণের প্রাথমিক ধাপ বোধহয় জলের অপচয় কমানো। আমরা প্রত্যেকেই জানি কী পরিমাণ জল শুধু অপচয়ের জন্য নষ্ট হয়। আমরা শহরের লোকেরা মুখ ধোওয়ার সময় বা দাড়ি কামানোর সময়ে বেসিনের কল খুলে রেখে জল নষ্ট তো করিই, জল নষ্ট হয় রাস্তার পুরসভার সময়ের কলে ট্যাপ না থাকায়। আধুনিক স্নানাগারে শাওয়ার বা সিস্টার্নের ব্যবহারেও প্রয়োজনের তুলনায় জল খরচ হয় বেশি। এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

পাশাপাশি দরকার বৃষ্টির জলের সংরক্ষণ। পৃথিবীর ব্যবহারযোগ্য জলের বেশির ভাগটাই আসে বৃষ্টি থেকে। কিন্তু এর অধিকাংশই বয়ে চলে যায়। এই জল ধরে রাখতে ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার। পুকুর খনন করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ বাংলার প্রাচীন দেশীয় পদ্ধতি। এই জলাধারগুলো শুধু যে পানীয় জলের সমস্যা মেটাত তা নয়, এলাকার জলস্তরকেও স্থিতাবস্থায় রাখত। এই ব্যবস্থা আবার গড়ে তোলা দরকার। যে পুকুরগুলো রয়েছে সেগুলো বাঁচাতে হবে। ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী পুকুরগুলোকে আলাদা করে সংরক্ষণ করতে হবে। যেমন, গ্রামের দু'একটা পুকুর থাকবে শুধু পানীয় জলের জন্য সংরক্ষিত, যেখানকার জল অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হবে না। প্রাকৃতিকভাবে সেই জল পানযোগ্য থাকবে।

শহরেও দরকার বৃষ্টির জল ধরে রাখা। এখন পুরসভাগুলো উদ্যোগ নিচ্ছে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের। বাড়ি তৈরির নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রেই শর্ত দেওয়া হচ্ছে বাড়ির ছাদের জল নলের সাহায্যে মাটির তলায় যাওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সব দায়িত্ব তো আর পুর-কর্তৃপক্ষের নয়, দায়িত্ব রয়েছে আমাদের নিজেদেরও। আমরা কি পারি না নলকূপ থেকে জল সংগ্রহের সময় ছোট মুখের বোতল বা কুঁজো ব্যবহার না করে বড় মুখের বালতি বা কলসি ব্যবহার করতে?

মনে রাখতে হবে জল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন পরিবেশ-বান্ধব কম ভোগের জীবন যাপন।

জল সংরক্ষণের কয়েকটি ঘরোয়া টিপস্

ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়

জল আমাদের জীবনরেখা। পৃথিবীতে জলের অভাব নেই। সেই ছোট বয়স থেকে জেনে এসেছি 'পৃথিবীর তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল', তবু জল নিয়ে হাহাকার। কেন? পৃথিবীতে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় অবস্থায় প্রায় ১৩৬ কোটি ঘন কিলোমিটার জল আছে বটে, কিন্তু তার ৯৭ শতাংশই নোনা। এই জল সরাসরি মানুষের কোনও কাজে লাগে না। বাকি ২.৮ শতাংশ জল মিষ্টি বটে, কিন্তু এর মধ্যে ২.১৫ শতাংশই তো দুই মেরুতে চির তুষার হয়ে জমে আছে। ফলে এটাও কাজে এল না। বাকি রইল মাত্র ০.৬৫ শতাংশ। এই জলটুকু আবার বিভিন্ন ভাবে রয়েছে। কিছুটা মাটির নিচে ভৌম জল রূপে, কিছুটা বা গ্যাসীয় অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে, বাদ বাকিটা নদী-হ্রদ-পুকুর-ডোবায়। দেখা গেছে পৃথিবীর মোট জলভাণ্ডারের মাত্র ০.০১ শতাংশ মানুষের ব্যবহার যোগ্য। এই জল

এর পর তিনের পাতায়

দুয়ের পাতার পর

মানুষ ব্যবহার করছে তার নানা কাজে। পৃথিবীতে প্রতি বছর গড়ে প্রায় সাড়ে আট কোটি মানুষ বাড়ে। আবার পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার ফলে জল নিয়ে উন্নয়নের জন্য জলের ব্যবহারও বাড়ছে প্রতিনিয়ত। ফলে কোথাও ভূ-গর্ভস্থ জলের পরিমাণ নেমে আসছে, কোথাও অত্যধিক রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে জল হচ্ছে দূষিত, কোথাও পরিবেশের মাত্রাধিক ক্ষয়ক্ষতির ফলে খরা ও তীব্র জলসংকট দেখা দিচ্ছে, আবার কোথাও জীবাণু মুক্ত নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছে শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। আবার এও দেখা যাচ্ছে, পৃথিবী জুড়ে মানুষের বার্ষিক ব্যবহার্য জলের চাহিদা প্রতি ২০ বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে। জল নিয়ে তৈরি হচ্ছে হাজারোও সমস্যা। যেগুলি কোনও ভাবেই জলবৎ তরলং থাকছে না। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে এর থেকে মুক্তির উপায় কি আছে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলের পরিমিত ব্যবহার, অপচয় রোধ এবং উপযুক্ত সংরক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে এই সমস্যাও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। কিন্তু কী ভাবে? আসুন, জেনে নিই প্রাত্যহিক জীবনে জলের অপচয় বন্ধ করার দু-ডজন টিপস্।

● সর্বদা একটা কাজে ব্যবহার করা জল অন্য কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন। ড্রেনে ফেলার আগে একবার ভেবে দেখুন এই জলটা আর কী কাজে আপনি লাগাতে পারেন।

● বাড়ির ছাদের ট্যাঙ্কে ছোটখাটো ফুটো নেই তো, যা দিয়ে একটু একটু করে জল চুঁইয়ে পড়ে প্রতিদিন? থাকলে সেটা আজই সারিয়ে ফেলুন। খানিকটা অপচয় বন্ধ হবে।

● বাড়ির কোনও ট্যাপ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ে সবসময়? সারিয়ে নিন তাড়াতাড়ি। জানেন কি, যদি সেকেন্ডে এক ফোঁটা করে জল পড়ে আপনার কল থেকে, তাহলে বছরে ২,৭০০ গ্যালন জল অযথা নষ্ট করার দায় আপনার ওপরেই পড়বে।

● কল খুলে রেখে প্রবহমান জলে ফলমূল তরিতরকারি ধোয়ার বদ অভ্যাস ত্যাগ করুন। একটা বড় পাত্রে জল ভরে ওগুলো ধুয়ে নিন। এতে অনেক কম জল লাগবে।

● চাল, ডাল, তরিতরকারি ধোয়া জল ফেলে দিলেন কেন? ওটা গাছের গোড়ায় দিয়ে দিন।

● ডিপ ফ্রিজে রাখা মাছ বরফ হয়ে গেছে? কল খুলে জলের তলায় ধরে বরফ কাটাতে যাবেন না। অনেক জল নষ্ট হয়ে যাবে। রান্না করার বেশ কিছুক্ষণ আগে একটু মনে করে ফ্রিজ থেকে বাইরে বের করে রাখুন না। বাড়িতে হঠাৎ করে অতিথি এসে গেছে, কী করবেন? তাহলে মাইক্রোওভেনটাকেই ডিফ্রস্টের কাজে লাগান : তবু জল নষ্ট করবেন না।

● বাসনপত্র ধোয়ার সময় কল খুলে রেখে বাসন ধোবার অভ্যাস ত্যাগ করুন। একটা বড় পাত্রে সাবান জল করে প্রাথমিক ভাবে পরিষ্কার করে, এবার ধুয়ে নিন। কম জলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

● রান্নাঘরের বেসিনে তরকারির কুচো খোসা, পাঁউরুটির টুকরো ফেলে সেগুলো জল ঢেলে ঢেলে ড্রেনে নাইবা পাঠালেন। কঠিন জিনিসগুলো আলাদা পাত্রে রাখুন, সময়মতো ময়লা ফেলার পাত্রে ফেলে দিন।

● এক গ্লাস জল নিয়ে দু-এক চুমুক খেয়ে বাকি জল ফেলে দেবেন না। গ্লাসে ঢাকা দিয়ে রাখুন, আবার তেষ্টা পেলে খাবেন।

● অল্প কিছু খাবেন? ছোট পাত্র নিন। যত বড় পাত্র নেবেন ধুতে তত বেশি জল লাগবে। এতে মাসে বাঁচবে প্রায় ২০ গ্যালন পর্যন্ত জল।

● কাপড় ধোয়া জলটা ফেলে দেবেন না। ওটা দিয়ে বাথরুম, উঠান বা ড্রেনটা ধুয়ে ফেলুন না।

● বাড়িতে ওয়াশিং মেশিনটা আছে বলেই চালাতে হবে? অল্প কয়েকটা জিনিস থাকলে হাতেই কেচে নিন। এতে আপনি মাসে ১০০০ গ্যালন পর্যন্ত জল বাঁচাতে পারবেন।

● হাতমুখ ধোয়া বা ব্রাশ করার সময় অযথা বেসিনের কল খুলে রাখবেন না। আগে ব্রাশ করে নিন বা মুখে হাতে সাবান দিয়ে নিন, তারপর একমগ জল নিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এতেও মাসে বাঁচবে প্রায় ২৫ গ্যালন জল।

● বাথরুমে অপ্রয়োজনীয় ফ্লাশ টানা বন্ধ করুন। প্যানে কেন — টিসু পেপার, পোকামাকড় ফেলার জন্য নোংরা কাগজ ফেলার পাত্র তো আছেই।

● বাথরুমে ছোট সাইফোন বসান। ৫ লিটার কেন আড়াই লিটারই তো কাফি।

● শাওয়ার খুলে চান করার দীর্ঘদিনের অভ্যাসটা না হয় ত্যাগ করলেন। বালতিতে জল নিয়ে স্নান করুন। মাসে প্রায় ১৫০ গ্যালন পর্যন্ত জল বাঁচবে এতে।

● বাথটবটা যখন বাথরুমে আছে, আপনি তাতে চান করবেনই। চেষ্টা করুন টবটা এক-তৃতীয়াংশ ভরতে। ওটুকু জলই লাগে আপনার সুখস্নানে।

● শীতকালে গরম জলে চান তো করবেনই। কিন্তু একটা বালতিতে আগে ঠান্ডা জল নিয়ে, তারপর তাতে পরিমাণ মত গরম জল মেশান। অনেকটা জল গরম করে, তার খানিকটা ফেলে, ঠান্ডা জল দিয়ে জল ঠান্ডা করে, অযথা জল নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন, এক ফোঁটা জল আজ একটা জীবনের তুল্য।

● অ্যাকুরিয়ামের জল পালটাবেন? ফেলে দেবেন না, টবে দিয়ে দিন। পুষ্টিযুক্ত এই জল আপনার গাছে সারেরও কাজ করবে।

● বাড়ির কুকুরটাকে লনে নিয়ে গিয়ে চান করান না, তাহলে আর আলাদা করে ঘাসে জল দিতে হবে না।

● সন্ধ্যার দিকে গাছে জল দেবার অভ্যাস করুন। এতে সারা রাত মাটি জল শুষে আর্দ্র হয়ে থাকবে। বাষ্পীভবন হবে কম। কিন্তু সকালবেলা গাছে জল দিলে বেশির ভাগ জলই সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে যাবে, ফলে অপচয়ের মাত্রা বাড়বে।

● গাছে জল দেবার সময় একেবারে একটু বেশি করে জল দিন, কিন্তু রোজ জল দেবেন না। এতেও নষ্টের পরিমাণ অনেকটাই কমবে।

● নিজে গাড়ি না ধুয়ে গ্যারাজে দিন। ওরা অনেক কম জল ব্যবহার করে ঝাঁ চকচকে করে দেবে আপনার গাড়ি।

● আপনার বাড়ির ক্ষুদ্রতম সদস্যটিকেও শেখান, যেন জল নষ্ট না করে, ব্যবহারের পর যেন ঠিক করে কল বন্ধ করে। ওরা আপনার আমার থেকে অনেক সাবধানী। দেখবেন, ভবিষ্যতে ওই একদিন আপনার ভুল ধরিয়ে দেবে।

এর পর ছয়ের পাতায়

তিনের পাতার পর

ভাবছেন এই সব ফালতু কথা শুনে কী হবে? নইলে, আপনার ছোট্ট সোনাটিকেই যে হতে হবে সেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক, কয়েক দশকের মধ্যেই যে যুদ্ধ শুরু হবে শুধু তেষ্টা পেলে এক গ্লাস জল খাওয়ার জন্য।

সবুজনারীবাদ — লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরম্পরা

সোমা বসু

পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন শুরু হয়েছে আজ থেকে প্রায় আড়াইশ কোটি বছর আগে। তবে মানুষ এসেছে মাত্র তিন লক্ষ বছর আগে। শিকার করে, বন-জঙ্গলের ফল-মূল সংগ্রহ করে আর পাঁচটা প্রাণীর মতোই তার দিন কাটত। অজানা ছিল বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির ব্যবহার। পৃথিবীতে মানুষ যেদিন আগুনের ব্যবহার শিখল, চাকা তৈরি করল — সেদিন থেকেই যাত্রা শুরু বিজ্ঞানের। যদিও তা আজকের মতো প্রতিষ্ঠানিক রূপ নেয়নি। প্রযুক্তিই ছিল সেই বিজ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। বংশ পরম্পরায় সেই প্রযুক্তিই দক্ষ থেকে ক্রমে দক্ষতর হয়েছে। এগিয়েছে সভ্যতা, আধুনিক হয়েছে মানুষ।

আধুনিক সভ্যতা শুরু হয়েছে মাত্র পাঁচশ বছর আগে, শিল্প বিপ্লবের পথ ধরে। এর পরের ইতিহাস হল ইউরোপের শক্তিশালী জাতিগুলোর পৃথিবী জয়ের ইতিহাস, যার পরিণতিতে এই পৃথিবীর দিকে-দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার, প্রকৃতির ওপর বেহিসেবী হস্তক্ষেপ আর শিল্পায়ন, দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ। মোটামুটিভাবে পৃথিবীতে শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার মানব সমাজের বিভিন্ন বিকাশের (খারাপ বা ভাল) জন্য হয়েছে, তাতে পরিবেশের অনেক সময়েই ক্ষতি হয়েছে ঠিকই - তবে তা ব্যাপক আকার নিয়ে বিপর্যয়ের চেহারা নেয়নি। শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে এক শ্রেণির মানুষ মুনাফার জন্য কাজে লাগাতে শুরু করল - বাণিজ্য করল গোটা পৃথিবী জুড়ে, তখনই গোল বাঁধল পরিবেশের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। উন্নয়ন (!) সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু পরিণামে ঘটে পরিবেশের ক্ষতি।

গত তিরিশ বছরের তথ্য ও বাস্তব বলছে যে পুঁজির 'অবাধ ও মুক্ত বিচরণ সব সময়েই পরিবেশের ভারসাম্যবিরোধী বা অ্যান্টি ইকোলজিক্যাল। Foster তাঁর 'Marx's Theory of Metabolic Rift' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন "There is an irreversible environmental crisis within global capitalist society." তাই বিশ্বায়নের সঙ্গে পরিবেশ ধ্বংসের হারও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে।

পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে নানান আর্থ-সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে নারী, বিশেষ করে গ্রামীণ নারী আজ জর্জরিত। এই যন্ত্রণা থেকেই প্রকৃতি ও পরিবেশ ঘিরে নারীর স্বাতন্ত্র্য চিন্তা ও চেতনা — জন্ম ইকোফেমিনিজমের।

ইকোফেমিনিজম - সবুজনারীবাদ! এমনিতেই ফেমিনিজমের চিন্তা-চেতনা নিয়ে এন্তার গাদা গাদা তত্ত্ব আর বইয়ের পাহাড়। তার ওপর ইকোফেমিনিজম! একে প্রকৃতি-পরিবেশ তাও আবার নারী - দুয়ে মিলে সে তো পর্বত। ইকোফেমিনিজমের সবচেয়ে প্রচলিত তত্ত্বটি হল, মেয়েরা প্রাণের জন্মদাত্রী, জীবনের প্রতিপালিকা, জীববৈচিত্র্যও তারাই সুরক্ষিত রাখে ও রাখতে পারবে তাদের প্রকৃত স্নেহের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু, ইকোফেমিনিজমের বিরোধী তা স্বীকার করে না, তাদের মতে নারী বনাম পুরুষ - এই ধারণাটাই পশ্চিমী। তৃতীয় বিশ্বের এমন অনেক দেশ, সমাজ, সংস্কৃতি, গোষ্ঠী আছে যেখানে এই ধারণা চলে না। সেখানে আছে সবার মধ্যে সংহতি। আর এক দলের বক্তব্য 'মেয়েরা জীববৈচিত্র্যের রক্ষাকারী' এ রকম কোনও সাধারণীকরণ চলে না। ভূমিহীন, দরিদ্র কোনও গ্রামবাসী বা কোনও সেরকম মাকে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে হলে গেঁড়ি-গুগলি, কচ্ছপ, পাখি, ছোট-বড় জন্তু - সবই তার ভক্ষ্য হবে। জীববৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামালে তার চলবে না।

কিন্তু আমাদের দেশে অভিজ্ঞতা কিন্তু ইকোফেমিনিজম-এর মতকেই সমর্থন করে। ঘটনাটি বাঁকুড়া জেলার। গ্রামের মেয়েরা বনবিভাগের কাছে কিছু ফলের গাছের চারা দাবি করে। কারণ, এতে বনসৃজন, জ্বালানি এবং খাদ্য - সবেরই কিছুটা সমাধান হয়। কিন্তু আশ্চর্য, বনবিভাগ এবং তার কর্তাদের মর্জি! তারা গ্রামের পুরুষদের চাহিদা মতো চারা দেয় ইউক্যালিপটাসের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সামাজিক বনসৃজনের প্রকল্পের আওতাধীন এই গাছটি বিতর্কিত। আমাদের দেশের গ্রামের একেবারে হতদরিদ্র পরিবারের মা-ঠাকুমারাও জীববৈচিত্র্য নিয়ে মাথা ঘামায়। বরং মাথা না ঘামালেই তার দিন চলবে না। সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে গেঁড়ি-গুগলি-সবই তার ভক্ষ্য ঠিকই, কিন্তু সে তার একান্তে নিজস্ব এক অনুপাত তত্ত্বে তার ভক্ষ্য সংখ্যা বাঁচিয়ে চলে। 'ভাঁড়ে মা ভবানী' হলে তার দিন কাটবে না। মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামের থেকে একটা মুস্কিল আসান গান সংগ্রহ করেছিলাম। সেই গানেও রয়েছে এই জীববৈচিত্র্য বাঁচিয়ে রাখার এক চিরন্তন তথ্য। বিষয় : বিভিন্ন প্রকার শাকের উপকারিতা, কোন মাসে কোন শাক খাওয়া যায় এবং কোন শাক খেয়ে কোনমতে বাঁচবে বেঁচে আছে মা আর মেয়ে।

মেয়েরা প্রাণের সংরক্ষণে, জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পুরুষের তুলনায় বেশি দড়, সে বিষয়ে স্বীকৃতি দিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জ, ১৯৯২ সালে রিয়ো-র বসুন্ধরা সম্মেলনের দলিলেই বলা হয়েছে, 'মেয়েরা চারপাশ সম্বন্ধে অনেক বেশি যত্নবান, অহিংস। তারা পুরুষের তুলনায় অনেক দক্ষতার সঙ্গে এ পৃথিবী এবং নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।' ভারতই প্রথম গোটা বিশ্বে এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছিল চিপকো আন্দোলনের মাধ্যমে। যারও পুরোধা ছিলেন এক নারী - সরলা বেন, যাঁরা প্রথম আন্দোলনের স্লোগান দিলেন জীববৈচিত্র্য বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে। এঁরা বলেছেন, অরণ্য শুধু সম্পদ আহরণ ও অপহরণের উৎস নয় - জল, মাটি, বাতাসের জন্যও চাই অরণ্য। এই আন্দোলনের পূর্বপ্রেক্ষিত হল ষাটের দশকে গড়ে ওঠা 'উত্তরাখণ্ড সর্বোদয় মণ্ডল' - এঁরা বনভূমির অধিকার রক্ষার লড়াই এ নামেন। হিমালয়ের জঙ্গলের উপর ব্যবসায়ীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমেই জোরালো হতে থাকে। কবি ঘনশ্যাম রাতুরির কবিতায় লেখা একটি শব্দ 'চিপকো' অর্থাৎ জড়িয়ে ধরে গাছ কাটা আটকানো লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। গাছকাটা আটকানোর এই রীতি অবশ্য একটি প্রাচীন রীতি। রাজস্থানে পঞ্চদশ শতাব্দীতে মাড়ওয়ার অঞ্চলের বিশনয়

এর পর পাঁচের পাতায়

আগের পাতার পর

গোষ্ঠীর মধ্যে বৃক্ষ ও প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেন গুরু জম্ভাজী। কারণ, ওই অঞ্চলে প্রায়ই ভয়ঙ্কর খরা দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যোধপুরের রাজার নির্দেশে কাঠের জন্য ওই অঞ্চলের গাছ কাটতে এলে অমৃতাদেবী গাছ জড়িয়ে ধরেন এবং তার দেখাদেখি অন্যান্যরাও তাই করেন। রাজার সেনারা তাদের সবাইকে হত্যা করে। এই আন্দোলনেরই বিশে শতাব্দীর রূপ হল চিপকো। সরলা বেন, গৌরী দেবী ছাড়াও ছিলেন অসংখ্য আদিবাসী মহিলারা। ১৯৭৩ সালে রাতের অন্ধকারে বৃক্ষলুণ্ঠন করতে এলে মেয়েরা গাছ জড়িয়ে ধরেন। ১৯৭৪ সালে রাতের পর রাত জেগে সাতাশ জন মহিলা পাহারা দেন। ১৯৭৭ সালেই এক ঠিকাদারের স্ত্রীর-ই নেতৃত্বে দিনরাত চলে পাহারা। ১৯৭৮ সালে বহু আদিবাসী মহিলাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে যে দাবি জোরালো হয়ে ওঠে তা হল অরণ্যের মূল প্রজাতি বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। পশু খাদ্য সংগ্রহ ও হালকা জ্বালানি সংগ্রহে মেয়েদের অধিকার থাকবে। অর্থাৎ পরিবেশ রক্ষার জন্য বাস্তুতন্ত্র রক্ষার কথা বলেছেন আমাদের দেশের মেয়েরা। তাঁরা অরণ্য প্রজাতির স্বাভাবিক বিকাশ ও সংরক্ষণ চেয়েছেন। এই বার্তায় সব কিছুই রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণের যোগ্য উপলব্ধি করল মানুষ। পাশাপাশি, আদিবাসীরা অরণ্য ধ্বংস করে — এই ভ্রান্ত, প্রচলিত ধারণারও অবসান সহজ হল। জীবন বিধ্বংসী অরণ্যের পরিবর্তে এরা চেয়েছিলেন জীবনদায়ী অরণ্য। পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে নারী ও পুরুষদের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্ট বিভাজন রেখা ধরা পড়তে থাকে। কারণ, এঁরা দেখেছিলেন হিমালয়ের স্বাভাবিক বনজ সম্পদ পুনরুদ্ধারের জন্য মিশ্রিত বনাঞ্চলের পরিবর্তে তৈরি হওয়া শুধুই পাইনের জঙ্গল - গাড়োয়ালি মেয়েদের - আর্থিক অবনতির কারণ। সবচেয়ে বড় কথা, এরা পরিবেশ ও নারী সম্পর্ককে নির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করেছে। ফলে, ১৯৯২-র সম্মেলনে পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের নানা কারণের মধ্যে নারী ও পরিবেশের সম্পর্ক অন্যতম বলে চিহ্নিত বলে বিবেচিত হয়েছে।

১৯৯২-র রিয়ো-তে প্রকৃতি-পরিবেশ এবং নারী নিয়ে এত চিন্তা ভাবনার পূর্বপ্রেক্ষিত সত্তরের দশকের এই আন্দোলন '— এটা ভাবা ভুল। কারণ, তৃতীয় বিশ্ব, তায় ভারতবর্ষ একরকম কোন একটা ভাবনার জন্ম দিচ্ছে আর পশ্চিমী অবদান ছাড়াই গোটা পৃথিবী তা মেনে নিচ্ছে, তা কখনও হয় নাকি? ফলে, প্রচলিত পশ্চিমী ঐতিহ্যে যা পুরুষের আধিপত্যবাদ — বিজ্ঞান-প্রযুক্তি পুরুষের — এতদিন ধরে 'প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ'— এই পুরুষপ্রাধান্য ভাবনাটিরই রমরমা প্রচলন ছিল। এই ভাবনারই বিপরীতমুখী পশ্চিমী ভাবনা হল 'গেইয়া তত্ত্ব'।

১৯৭৮ সালে বিজ্ঞানী জেমস লাভলক হাজির করলেন, অবশ্যই নতুন করে গ্রিক পুরাণের পৃথিবীর দেবী গেইয়াকে, লিখলেন —'গেইয়া : আ নিউ লুক অন লাইফ অন আর্থ।' কী বলেন? 'পৃথিবী এক সজীব প্রাণী, তার নিজস্ব সত্তা আছে।' অর্থাৎ মানবকেন্দ্রিক উপযোগিতাবাদী চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে এই তত্ত্ব বলে সবার বাঁচার অধিকারের কথা।

মানুষ এতদিন নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে পৃথিবী প্রকৃতি জয় করেছে, অন্যের (জড় বা প্রাণ) অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে অথবা নিজের প্রয়োজনের মাপকাঠিতে - যে প্রয়োজনটা কখনও মেটে না - মেটার নয়। 'Earth has enough for everyone's need but not for anyone's greed (M.K.Gandhi)'। অবশ্য এর আগেই ১৯৭৮ সালে এক নারীবাদী শার্লিন স্প্রেটনাক-ও লিখেছিলেন 'লস্ট গডেসেস অব আর্লি গ্রিস' - এই সভ্যতায় পৃথিবী এবং দেবীদের স্থান ছিল অনেকটা উঁচুতে। ইকোফেমিনিস্টরা অবশ্য লাভলককেই স্বীকৃতি দিলেন বেশি, পুরুষ বলে বাতিল করলেন না। চিত্র প্রদর্শনী, গান, পোস্টকার্ড সব দিক দিয়েই গেইয়া দেবী বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। সম্প্রতি, নেট সার্চ করে 'গেইয়া' নামে দেশী-বিদেশী যা বইয়ের ভাণ্ডার দেখলাম, তাতে তো চক্ষু চড়কগাছ! অথচ, আমরা প্রায় সাড়ে চারশো বছরের বেশি ধরে গেইয়া-র থেকেও এক শক্তিশালী দেবী ঐতিহ্য বহন করছি।

বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদা করে কেলি।
গণার মূষায় কাটে ঝুলি আমি খাই গালি।।
একত্রে শুইতে নারি সাপের নিঃশ্বাসে।
তার অধিক প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে।।

মা দুর্গার পরিবার-পরিজন, পোষ্য। এদের নিয়েই মুকুন্দরামের কবিকঙ্কন চণ্ডী। অভাবের সংসার, বাঘছাল পরে দিন কাটে, সাপ, ইঁদুর, ময়ূর - সবাই জ্বালাতন সহ্য করেন - তবুও ওদের তাড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবেন না। এরা সবাই তাঁর সংসারের আপনজন - একান্তজন। এঁদের নিয়েই তাঁর নিজস্ব জগৎ। এমনকী পোষ মানে না এমন হিংস্র পশুরাও তাঁর শরণ নিয়েছে। তিনি তাদের আশ্বস্ত করেছেন, রক্ষা করেছেন।

অপরাধ বিনে পশু সবাই সশঙ্ক।
বর দিয়া ভগবতী কর নিরাতঙ্ক।।

মাধবের চণ্ডীর রচনাকাল ১৫৮৯ খ্রিস্টাব্দ। এই চণ্ডীর ওপরেই তুলি ধরে চিত্র অনেক বেশি উজ্জ্বল করেছেন মুকুন্দরাম কবিকঙ্কন। মাধবাচার্য আকবর বাদশাহের সমসাময়িক। এ ছাড়াও দুর্গার লোকায়ত উৎস তো আরও পুরানো। বিশ্বায়নের বাজারে আমরা তুলে ধরতে পারি না, সেটা আমাদের ব্যর্থতা। গেইয়া তত্ত্বে মশগুল তাবৎ পশ্চিমী সাহেব মেমরা রোমান, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, রেডইন্ডিয়ান - কোন কিছুরই সৃষ্টি কাহিনি খুঁজতে বাকি রাখেনি, আমাদের দেশে বন্দনা শিবা দেবী অরণ্যানী নিয়ে লিখেছেন। যদিও তা লোকায়ত উৎস হারিয়ে, খুব বেশি করে 'হিন্দু', 'হিন্দুনারী' হয়ে উঠেছেন।

পশ্চিমী চিন্তাবিদদের খোঁজাখুঁজির ফলে প্রাক খ্রিস্টীয় সব সৃষ্টি-কাহিনিতে, আদি এবং আদিবাসী পুরাণে পাওয়া গেল এক সৃষ্টিকর্ত্রীর কথা – যার সঙ্গে গেইয়া দেবীর বেশ মিল আছে। অথচ, এই সব পশ্চিমী সাহেব-মেমরা আমাদের মার্কণ্ডেয় পুরাণের শাকম্ভরী দেবীর খোঁজই পেলেন না। ১০০ বছর ধরে অনাবৃষ্টি হলে যিনি কিনা নিজের শরীর থেকে শাক উৎপন্ন করে পৃথিবীর সবাইকে প্রতিপালন করেছিলেন। নারীর প্রকৃতি পরিচর্যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ আর কী হতে পারে! ফিরে যাওয়া যাক চণ্ডীমঙ্গলের কথায়। বিভিন্ন দেশে পরিবেশের অবক্ষয়, দূষণ ইত্যাদি ওপর গবেষণা চালিয়ে জমতে থাকা তথ্যের পাহাড়ে যে জিনিস বারে বারে উঠে আসে তা হল পুরুষের চেয়ে নারীর পরিবেশ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ধারণা-চেতনা। পোষ মানে না হিংস্র পশু - যারা কিনা মানুষের (পুরুষের) আধিপত্যবাদ আর প্রয়োজনের শিকার — সেই বন্য

এর পর ছয়ের পাতায়

শাঁড়ের পাতার পর

পশুও আশ্রয় খোঁজে মার আঁচলের তলায়।

অপরাধ বিনে ....।

....................নিরাতঙ্ক।।

সাড়ে চারশো বছর পরে সেই আত্মদান এই পৃথিবী শোনে আর এক নারীর মুখে ষাটের দশকের শুরুতে। রাচেল কারসন, লিখলেন 'সাইলেন্ট স্প্রিং'। তিনি লিখেছিলেন, 'পৃথিবী ক্রমেই সমস্ত প্রাণীদের নিয়ন্ত্রণ ভাবনাটির অযোগ্য হয়ে উঠছে।' 'স্তব্ধ বসন্তের' শেষে লিখলেন - 'প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ ভাবনাটির জন্ম খুবই ঔদ্ধত্যমূলক ...... এই ভাবনা নিজেকে আধুনিক ভয়ঙ্কর অস্ত্রে সজ্জিত করে আক্রমণ করেছে কীটপতঙ্গকে, যে আক্রমণ শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে'। (কারসন, ১৯৬২, পৃ: ২৫৭)।

প্রকৃতি-পরিবেশ বাঁচানোর চিন্তাভাবনা চণ্ডীমঙ্গলের বেশ একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। রাজারহাট-নিউটাউন কোন নতুন ঘটনা নয় - সাড়ে চারশো বছর আগেও স্রেফ বন কেটে নগরায়ন হয়েছে। কিন্তু, এখনকার মতো পুকুর বুজিয়ে, কৃষি জমি ভরাট করে, চারদিকে শুধুই বহুতল আর বহুতল নয়।

এখানেও নির্বিবাদে বনকাটার বর্ণনা রয়েছে। রয়েছে পশু মারার আর গাছ কাটার তথ্য, আজকের ভাষায় বায়োডাইভার্সিটি তছনছ করে দেবার বিবরণ - ছাতিম, নিম, পারুল, দেবদারু, শিমুল, শিরীষ কী না গাছ কেটেছে। কিন্তু, এত কিছু কাটাকাটি সত্ত্বেও কিছু কিছু গাছ না কেটে রেখে দিল —

'অশ্বথ রাখিল মূল বান্ধিয়া
রাখিল রুদ্রাক্ষ কদম্বফল লবঙ্গ।'

এ ছাড়াও অসংখ্য ফুলগাছ, শিবপুজোর জন্য বিল্ববন, নগরের শোভা বাড়াতে তাল, নারকেলও রাখা হয়েছিল, আর আজকের ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট-এর চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান দেখিয়েছে -

'বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জন-বিশ্রাম
মূল বান্ধিবারে আনিল ঠৈবর।'

অর্থাৎ বট অশ্বথ গাছ কেটে নগরায়ন, নিউটাউন-রাজারহাট - সব ফ্ল্যাট, সব ফ্ল্যাট! দৈব দৈব চ। প্রয়োজনে কিছুটা কাটা হল বটে, কিন্তু, ইকোলজির ভারসাম্য রক্ষা করবে যে গাছগুলো, মাটিকে ধরে রাখবে, নতুন করে জন্মাতে সাহায্য করবে যে গাছ, তারা বেঁচে রইল সসম্মানে। বাঁচানো হল ছোট ছোট অসংখ্য গাছ, বিশেষ করে ফুলগাছ, সরোবর ঘিরে তৈরি হল বিশাল বন-উদ্যান।

'সরোবর বেড়ি বিশাই রচিল উদ্যান
পলাশ কাঞ্চন রম্ভা রোপে হনুমান।।'

....

'সেহালী বাকুলি চাঁপা টগর তুলসী
রঙ্গন মালতি ছাতি শেফালি অতসী।।'

ইকোসিস্টেম-ইকোলজিতে ফুলগাছের গুরুত্ব অপরিসীম। এরা প্রজাপতি, মৌমাছি, পিঁপড়ে, শামুক প্রভৃতির ছোট ছোট প্রাণী, কীটপতঙ্গদের রক্ষাকর্তা। নতুন নগর লোকবসতি — সবাই মিলেমিশে বেঁচে থাকা, কেমন সুন্দর একটা বাঁচার চক্র, বেঁচে থাকার আনন্দ চালু থাকছে এবং সর্বোপরি এই সব কিছুই একজন দেবী, নারী - মা ভগবতীকে কেন্দ্র করে সক্রিয় থাকছে। তিনিই তাঁর সস্নেহ প্রশ্রয়ে সবাইকে রক্ষা করছেন - পালন করছেন। যারা পরবর্তীকালে আসছে তারা সুন্দর মানসিকতায়, নগরায়নের সৌন্দর্যে পুলকিত হবে।

পৃথিবীর সজীবতা, তাঁরা রক্ষাকর্ত্রী - সব মিলিয়ে একেবারে জমজমাট ইকোফেমিনিজিম, এরপর বনদুর্গার, বনবিবি এঁদের লোকায়ত উৎস এবং প্রচলন নয় বাদ-ই দিলাম। আমাদের এমন সমৃদ্ধ লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও কেন যে 'বিদেশি মডেল' না হলে চলে না! জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ সংরক্ষণের এই সব উৎস নিয়ে নতুন করে গবেষণা, চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের বেশ কিছুটা কাজ কিন্তু করেই গেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর পরিবেশ ভাবনায় ব্যক্ত ছিল আসি এই সমস্ত উৎস এবং শান্তিনিকেতনের আশে পাশের নানান লোকসংস্কৃতি ও লোকায়ত ধ্যান-ধারণা। লোকসংস্কৃতির এই সব উৎসে, উপাদান নিয়ে আমাদের পরিবেশ ভাবনা - যা কিনা একান্তই আমাদের (ওরিয়েন্টালিজমের ছোঁয়া মুক্ত, ছায়াবিহীন) — তা খোঁজা জরুরি।

আমাদের প্রকাশিত বই

১. ল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (১৯৯২)।
২. দ্য ইগনোরড্ এনভায়রনমেন্ট, উপেক্ষিত পরিবেশ (১৯৯৮)।
৩. রণনীতি ও রণকৌশলের ইতিহাস (২০০৩)।
৪. অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী : ফিরে দেখা (২০০৩)।
৫. পরিবেশ (২০০৩)।
৬. ধূসর বসুধা (২০০৩)।
৭. এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়েকনিং (২০০৫)।
৮. এত আঁধার কেন (২০০৮)।
৯. প্রসঙ্গ : যুদ্ধ ও পরিবেশ (২০০৮)।
১০. প্রসঙ্গ : মানবাধিকার ও পরিবেশ (২০০৮)।
১১. শিকড়ের সন্ধানে: হুগলি জেলা (২০০৯)।
১২. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ফিরে দেখা (২০০৯)।
১৩. জলবায়ু পরিবর্তন : এক অশনি সংকেত (২০০৯)।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ অ্যাকাডেমি, সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৮৩৩২০৮০০৩, ৯৪৩৩৫১৫৩৫৪; ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in